ধারাবাহিক রচনা

স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা প্রবন্ধের ভাষারীতি ও পরবর্তী বাংলা সাহিত্য

অভিজিৎ মাইতি

৭. চলিত গদ্য রীতি ও প্রবন্ধ সাহিত্য/ রম্যরচনা

এবার দেখা যাক ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বা রম্যরচনায় চলিত গদ্যের ব্যবহার কতটা স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছিল। আমরা বারবার ব্যক্তিগত প্রবন্ধ ও রম্যরচনাকে একইসঙ্গে উল্লেখ করছি তার কারণ, এ-দুয়ের মধ্যে তফাত করা অনেক সময় সম্ভব হয় না। ব্যক্তিত্বের প্রকাশে, ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব অনুভূতির রঙে রাঙা হয় যদি ব্যক্তিগত প্রবন্ধ, তাহলে তার মধ্যে রম্যরচনার অন্তরঙ্গতা, বৈঠকি মেজাজ, রসিকতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয় অনায়াসে। ফলে এ-দুয়ের পার্থক্যও মুছে যায়। এই পার্থক্য মুছে যাওয়াটা কতটা স্বাভাবিক তা আমরা লক্ষ করেছিলাম বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্ত'তে বা স্বামী বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'-তে। এঁদের সময়ে তো এইসব সংরূপ আলাদা আলাদা করে তৈরি হয়নি। যাইহোক, আমরা এই ধরনের রচনায় বাংলা চলিত গদ্যের রূপকে দেখার চেষ্টা করব।

ক. সৈয়দ মুজতবা আলি (১৯০৪-১৯৭৪)

স্বামী বিবেকানন্দের পরে সৈয়দ মুজতবা আলির মতো বাংলা গদ্যে মৌখিক রীতির এমন সফল ব্যবহার আর দেখা যায় না। বহু ভাষাবিদ, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণকারী, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির একনিষ্ঠ অনুসন্ধিৎসু এই মুক্তমনা মানুষটি, মজলিসি মেজাজে বাংলা সাহিত্যে রমণীয়তার এক অনন্য নজির স্থাপন করেছিলেন। প্রমথনাথ বিশী তাঁর সাহিত্যকে, রচনার স্টাইলকে 'বৈঠকী চাল' বলেছেন।[৪৪] পরিমল গোস্বামী মনে করেছেন, ''মুজতবা প্রকৃত কথাশিল্পী, কথা বলার আর্ট তাঁর জন্মগত।''[৪৫] কৃত্রিমতাহীন সরল ভঙ্গিতে, অহংকারহীনভাবে, কৌতুকের সঙ্গে গভীর মমতা-শ্রদ্ধা-ভালবাসা নিয়ে কলমে কথা বলেন তিনি। তার ছাপ অবলীলায় মুদ্রিত হয়েছে গদ্যের শৈলীতে। প্রবন্ধ, রম্যরচনা, ভ্রমণসাহিত্য, উপন্যাস প্রভৃতি নানা ধরনের সাহিত্য রচনা করেছেন। সিরিয়াস বিষয়কেও সহজ ভঙ্গিতে, কৌতুকের মধ্য

দিয়ে, সরল গদ্যে অনায়াসভাবে বলার ক্ষমতা ছিল বলেই কোথাও পাণ্ডিত্যের ভার গদ্যকে কঠিন করেনি। 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'-র (১৯৫৬) মতো সিরিয়াস বিষয়ের প্রবন্ধটির গদ্যও যেমন আড্ডার সময় কথা বলার মতো করে রচিত—

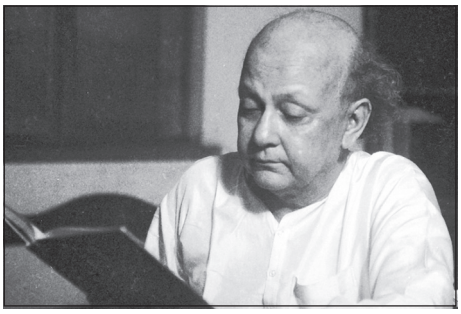
সৈয়দ মুজতবা আলি

''বিচক্ষণ লোক মাত্রই স্টেশনে লক্ষ্য করে থাকবেন যে হুঁশিয়ার-বাঙালী বিহারী মুটের সঙ্গে কদাচ উর্দুতে কথা বলে না। আর মুটে যদি তেমনি ঘুঘু তবে সেও বাংলা জানা থাকলেও আপন উর্দু চালায়। তবু তো বিহারী মুটেকে কিছুটা ভাল উর্দু জানা থাকলে ঘায়েল করা যায়, কিন্তু করাচীতে যে-সব উর্দুভাষীদের মোকাবেলা করতে হবে তাঁদের উর্দুজ্ঞান পয়লানম্বরী হবে নিশ্চয়ই। প্রেমালাপের কথা স্বতন্ত্র, সেখানে কোনো ভাষারই প্রয়োজন হয় না, টোটিফুটি উর্দু বললেও আপত্তি নেই।''[৪৬]

এই প্রবন্ধেই সৈয়দ উল্লেখ করেছেন, বুদ্ধদেব দেশজ ভাষায় ধর্মপ্রচার করেছিলেন, শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্ম লেখা হয়েছিল বাংলায় এবং শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচলিত নতুন ধারাকে তিনি দেখেছিলেন 'গণউপাসনার উৎস' থেকে।[৪৭] আরও বলেছেন, ''... রামকৃষ্ণদেবকে কেন্দ্র করে বাঙলা ভাষায় যে নবচেতনার উৎপত্তি হয়েছিল তখনকার বিদগ্ধ সমাজ (প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ) সেটাকে গ্রহণ করতে চাননি...।''[৪৮] তাহলে সৈয়দের ব্যক্তিত্বপ্রকাশক গদ্যশৈলী নির্মাণের পিছনে, এই বুদ্ধ-চৈতন্য-রামকৃষ্ণের লোকজীবন-আশ্রয়ী মুখের ভাষা ব্যবহারের দৃষ্টান্ত কি প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছিল, যেমনটা করেছিল বিবেকানন্দের বৈপ্লবিক দাবিতে? আমরা এই প্রশ্নটুকু তুলে, তারপর, সৈয়দের রম্যরচনা থেকে মুখের গদ্যের একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করব,

''লোকে লোকারণ্য। মধ্যিখানে মাচাঙ—তার উপরে মহারাজ আর মন্ত্রী। মন্ত্রী চেঁচিয়ে বললেন, 'মহারাজ জানতে চান তোমরা তোমাদের বউকে ডরাও কি না। তাই তাঁর হয়ে আমি হুকুম দিচ্ছি যারা বউকে ডরাও তারা পাহাড়ের দিকে সরে যাও আর যারা ডরাও না তারা যাও নদীর দিকে।'

যেমন না বলা অমনি হুড়মুড় করে, বাঘের সামনে পড়লে গোরুর পালের মত, কালবৈশাখীর সামনে শুকনো পলাশ পাতার মত সবাই ধাওয়া করলে পাহাড়ের দিকে, একে অন্যকে পিষে, দলে, থেঁৎলে—তিন সেকেণ্ডের ভিতর পাহাড়ের গা ভর্তি।

বউকে না-ডরানোর দিক বিলকুল ফর্সা। না, ভুল বললুম। মাত্র একটি রোগা টিঙটিঙে লোক সেই বিরাট মাঠের মধ্যিখানে লিক্‌লিক্ করছে।''[৪৯]

এখানে মুখের শব্দ, আরবি-ফারসি শব্দ, ধ্বন্যাত্মক শব্দ, লৌকিক উপমা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে যেভাবে লেখক মশকরা করেছেন তার জুড়ি মেলা ভার। ভয় পেয়ে পরিত্রাহি করে পালিয়ে যাওয়ার গতি গদ্যের সঙ্গে সমানে ছুটেছে যেন। সৈয়দ চলিত গদ্যে বিশেষ করে আলোচনার যোগ্য এই কারণে, তাঁর মতো করে সবধরনের লেখায় মুখের ভাষা-আশ্রয়ী চলিত গদ্যকে ব্যবহার এইসময়ের আর কোনও প্রাবন্ধিক করেননি। বাংলা সাহিত্যে বিবেকানন্দের পরে, চলিত গদ্যের সৃষ্টি ও সম্ভাবনার এমন সিংহফটক খুলতেও আর কেউ পারেননি।

খ. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০)

সৈয়দ মুজতবা আলির মতো ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বা রম্যরচনাতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। 'সুনন্দ' ছদ্মনামে তিনি যে 'সুনন্দর জার্নাল' (প্রথম পর্যায় ১৯৬৩-১৯৭০) লিখতেন 'দেশ' পত্রিকায়, তাতে তাঁর গদ্যশৈলীর চমৎকার নিদর্শন ধরা পড়েছে। জীবনের প্রতি একটি স্মিতসুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সুনন্দর। আর ছিল মানুষের প্রতি, সমাজের প্রতি এক অদ্ভুত সহমর্মিতা ও সহানুভূতি। এই গুণেই তাঁর গদ্যের মধ্যে একধরনের মাধুর্য প্রকাশিত হয়েছে। সঙ্গে রসিকতা করার ক্ষমতা, যা গদ্যের মধ্যে সূক্ষ্ম ও স্মিতকৌতুকের আবরণ বিছিয়ে দিয়েছে—

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

''খবরের কাগজে পড়া গেল, একটা গাধা হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে তিনজন মানুষকে কামড়ে দিয়েছে। ক্রমাগত খোঁচাখুঁচিতে তিত-বিরক্ত হয়েই শেষ পর্যন্ত তার এই দুর্ধর্ষ জাগরণ।

''গাধার মত অতীব সুশীল এবং নির্বাক ভারবাহী একটি প্রাণী এমন ঘোর বেগে বিদ্রোহ করতে পারে, এ দেখে আমার পাঠ্য দৈনিকটির রিপোর্টার বিস্মিত। কিন্তু গাধা যে দরকার হলে উত্তেজিত হতে পারে, নিদারুণ প্রতিহিংসা নিতে পারে, কোনো প্রাণীবিজ্ঞানী এ সম্বন্ধে কখনো সন্দেহ প্রকাশ করবেন না। গাধার ঐ ক্ষুদ্র আয়তনটির ভেতর থেকে মধ্যে মধ্যে যে উদাত্ত সঙ্গীত উদ্‌গীরিত হয়, তা থেকেই তার প্রচ্ছন্ন তেজস্বিতার জ্বালাময়ী পরিচয় মেলে।"[৫০]

গ. বিনয় ঘোষ (১৯১৭-১৯৮০)

বিনয় ঘোষ কালপ্যাঁচা ছদ্মনামে, হুতোমের অনুসরণে বেশ কিছু রম্যরচনা লিখেছেন। তির্যক দৃষ্টিতে, স্বাধীনতা পরবর্তী কলকাতার সমাজের নাগরিক-জীবনের নানা দিককে, নিজের মতো করে তুলে ধরেছেন। ফলে গদ্যও সেই তুলনায় চলিত রীতিকে অঙ্গীকার করেছে। যেমন,

''আরও একটা আশ্চর্য ব্যাপার হল এই যে আমি আপনি রাস্তা দিয়ে রিক্‌শার দিকে তাকাতে তাকাতে গেলেও কোন রিক্‌শাওয়ালাই হয়তো একবার ফিরেও তাকাবে না, কিন্তু রিক্‌শানুরাগী যারা তাঁরা আনমনে উল্টোদিকে হাঁ করে পথ চললেও তাঁদের গন্ধ পেয়েই রিক্‌শাওয়ালারা খৈনি ফেলে সচকিত হয়ে ওঠে এবং ঘন ঘন ঘণ্টা বাজিয়ে, এমন কি রিক্‌শা নিয়ে দৌড়ে কাছে এসে পর্যন্ত তাঁদের আহ্বান জানায়। রিক্‌শাওয়ালাদের সঙ্গে বোনাফাইড্ রিক্‌শাযাত্রীর এই যে গভীর আত্মিক যোগাযোগ, এটা কোলকাতা শহরে সত্যি একটা দ্রষ্টব্য জিনিস।"[৫১]

ঘ. বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র (১৯০৫-১৯৯১)

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র বিরূপাক্ষ ছদ্মনামে বেশ কিছু রম্যরচনা লিখেছিলেন। 'ঝঞ্ঝাট' (১৯৪৯), 'বিরূপাক্ষের অযাচিত উপদেশ' (১৩৫৬ বঙ্গাব্দ), 'বিরূপাক্ষের বিষম বিপদ' (১৩৫৭ বঙ্গাব্দ) প্রভৃতি তাঁর কয়েকটি রম্যরচনার বই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর এবং স্বাধীনতা পরবর্তী বাঙালি মধ্যবিত্ত-জীবনের রোজনামচার নানা সমস্যা, সংকট, অসংগতি প্রভৃতি নিয়ে এগুলি লিখিত। বেতারে পাঠ করার জন্য রম্যরচনাগুলি লিখেছিলেন। ফলে গদ্যের মধ্যে দৈনন্দিন কথ্য ভাষাই ব্যবহৃত হয়েছে এবং শ্রোতাদের কানে ধরার জন্য নাটকীয় ভঙ্গি, দৈনন্দিন জীবনের মতো প্রবহমান বর্ণনা, রসিকতার সরসতা দিয়ে গদ্য রচিত হয়েছে। তারাশঙ্কর মন্তব্য

করেছিলেন, ''বিরূপাক্ষের ঝঞ্ঝাট নতুন কালের জীবনের জটিলতাকে সহজ করার মধুর ব্যবস্থাপত্র।''[৫২] বিরূপাক্ষের গদ্য সেই সহজ ব্যবস্থাপনার সহজ লিখিত রূপ। যেমন,

''উঃ কী বৃষ্টি, বাপরে বাপ! তাও কি হোমিওপ্যাথি ডোজে, একেবারে ফুল হাইড্রোপ্যাথি চলল কদিন ধরে। যা সংকল্প করেছিলুম, তা তো হয়ে গেল পুজোর মধ্যে। ভেবেছিলুম, যাক, পুজোটা কাটবে নির্ঝঞ্ঝাটে, তার তো হিসেব গেল ঘুলিয়ে!

''মশাই পটকার জন্যে ঠায় রোদ্দুরে তিন ঘণ্টা লাইন ধরে দাঁড়িয়ে পাঁচ গজ ছিট, ঘেঁচির জন্যে ফ্রকের বাহারি কাপড়, গিন্নির জন্যে তিনটাকা দশ আনা দিয়ে সদ্য কোরা কাপড়, পান্তুর জন্যে একটা এগারো সিকি দিয়ে প্যাণ্টুলুন কিনে নিয়ে এলুম। পাড়ার তিনটি বাঁকে যে যা চাইলে, সর্বজনীন পুজোর চাঁদা দিলুম, ভেবেছিলুম তিন জায়গা থেকে মায়ের ভোগ এনে অন্তত নিজের ত্রিসন্ধ্যের রেশনটা বাঁচিয়ে ফেলব, তা হয়ে গেল! কোথায় ঠাকুর আর কোথায় ভোগ? কী আর করি?''[৫৩]

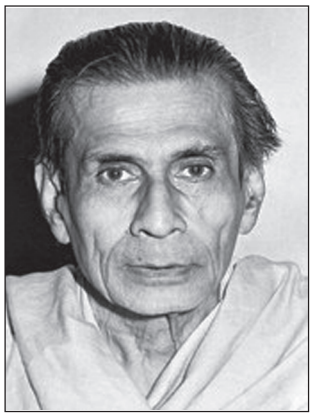

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

তারাপদ রায়

ঙ. তারাপদ রায় (১৯৩৬-২০০৯)

বাংলা সাহিত্যে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বা রম্যরচনার ধারায় তারাপদ রায় অবিস্মরণীয় মানুষ। জীবনের প্রত্যেকটি ছোটখাট দিক নিয়ে, প্রত্যেকটি ক্ষণকে, শুধু দেখার দৃষ্টিতে এমন মধুময় করে তোলা যায় তা তারাপদ রায় না পড়লে বোঝা যায় না। নিজেকে নিয়ে রসিকতা করার এমন ক্ষমতা কতজন লেখকের আছে তা অনুসন্ধান করা যেতে পারে। তাঁর গদ্যের মধ্যে উচ্ছল হাসি, গল্প বলার নাটকীয়তা, আমুদে মেজাজের একজন মানুষের আধুনিক দৈনন্দিন জীবন নিয়ে কথা বলার ভাষা প্রভৃতি পাঠককে উচ্চহাসির তৃপ্তিতে ভরিয়ে দেয়। তারাপদ তাঁর রম্যরচনা সমগ্র 'রম্যরচনা ৩৬৫' গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছিলেন রাজশেখর বসুকে 'পরমগুরু' সম্বোধন করে। যোগ্য শিষ্য মানস-গুরুর উত্তরাধিকারে কেরামতি দেখিয়েছেন। সেরকম কেরামতি থেকে তাঁর গদ্যের নিজস্বতার কিয়দংশ তুলে ধরা হল—

''কিন্তু অন্যের ঘুম নিয়ে রসিকতা করার অধিকার আমার নেই। আমি ঘুমইনি এমন কোনও জায়গা নেই। যে কোনও জায়গায় সামান্য এলিয়ে পড়তে পারলেই আমি ঘুমিয়ে পড়ি। বাসে, হ্যান্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে, ট্রেনের পাদানিতে ঝুলতে ঝুলতে বিভিন্ন বিপজ্জনক অবস্থায় আমি ঘুমিয়েছি। একবার চিৎ সাঁতার দিতে দিতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, আড়াই ঘণ্টা পরে ঘুম ভেঙে দেখি—নদীর ঘাটে ছিলাম, মধ্য নদীতে চলে এসেছি; গায়ের চামড়া সাদা হয়ে কুঁচকে গেছে।''[৫৪]

চ. প্রদ্যোতকুমার ভদ্র (১৯৩৯-২০০১)

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের পুত্র প্রদ্যোতকুমার ভদ্র বাবার মতোই রম্যরচনা রচনায় পটু ছিলেন। ত্রিশিরা ছদ্মনামে রম্যরচনাগুলি লিখেছিলেন। চারপাশের মানুষজনকে নিয়ে নাটকীয়তা সৃষ্টিতে তাঁর অনায়াস সাফল্য ছিল। কল্পনার সঙ্গে বাস্তবে দেখা মধ্যবিত্ত জীবনের নানা ঘটনাকে মিশিয়ে, বাক্‌পটুর মুখের ভাষার মতো গদ্যরচনা করেছেন। তাঁর সহজ, সুন্দর,

হাস্যরসে ভরপুর গদ্যের নিদর্শন এরকম,

''মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে। কবির ভুবন—ইনটিরিয়র ডেকরেশন খাসা হতে বাধ্য। কবিরা ওস্তাদ লোক। কল্পনার সার দিয়ে মরুভূমিতেও মালদার ল্যাংড়া ফলাতে পারেন। ওনাদের ধরন-ধারণই আলাদা। মন-মর্জির কোনো ঠিকঠিকানা নেই। এই মরিতে চাহি না, চাহি না বলে বায়নাক্কা, এই আবার মরণকে জড়িয়ে কত সোহাগ। তুঁহু মম শ্যামসমান, মরব-কি মরব-না ঠিক করতে করতে কবিদের দাড়ি পেকে যায়।''[৫৫]

ছ. সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৬-)

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় প্রচুর রম্যরচনা লিখেছেন। তাঁর রম্যরচনায় হিউমারের সঙ্গে উইট আছে। আবার নিছক হাসি বা ফানের দেখাও পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে জীবন সম্বন্ধে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়। ফলে গদ্যের মধ্যে কবিত্বময় বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়। তবে গদ্যের মধ্যে সবথেকে বেশি চোখে পড়ে একেবারে সহজ শব্দের সঙ্গে ছোট ছোট বাক্যের সহজ উপস্থাপনা। যেমন,

''নিজের 'ক্রিয়েশান'কে কে পাঁঠা ভাবতে পারে! তোমার সেই গল্পটা মনে পড়ে কি? এক মূর্খ, কিছুতেই তার কিছু হয় না। মনের দুঃখে নদীর ধারে বসে আছে। হঠাৎ চোখে পড়ল পাথরের ধাপে একটি মানানসই গর্ত। কী করে হল? এক মহিলা এলেন স্নানে। কোমরের কলসিতে জল ভরে রাখলেন, ওই ক্ষয়ে যাওয়া জায়গাটিতে। ও, আই সি। মূর্খ লাফিয়ে উঠল, ঘর্ষণে পাথরও ক্ষয়, তবে?''[৫৬]

আমাদের আলোচিত প্রাবন্ধিকরা ছাড়াও অনেক প্রাবন্ধিক আছেন যাঁদের চলিত গদ্য বাংলা সাহিত্যে নতুন নতুন সৃষ্টি ও সম্ভাবনার জন্ম দিয়েছে। রূপদর্শী ছদ্মনামে গৌরকিশোর ঘোষ, সাগরময় ঘোষ, পরিমল গোস্বামী, কুমারেশ ঘোষ, হিমানীশ গোস্বামী; একেবারে অধুনাতম লেখক যাঁরা আজও লিখে চলেছেন তাঁদের মধ্যে স্বপ্নময় চক্রবর্তী প্রমুখ ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বা রম্যরচনায় চলিত গদ্যের আশ্রয়ে নানা শৈলী গড়ে তুলেছেন। বস্তুত বিবেকানন্দের প্রস্তাবিত চলিত গদ্য রীতির উত্তরাধিকারী যদি খুঁজতে হয় তাহলে ব্যক্তিগত প্রাবন্ধিক বা রম্যরচনাকাররাই ওই ধারার সবথেকে সহজলভ্য উত্তরাধিকারী হবেন বলে মনে হয়।

৮. 'উদ্বোধন' পত্রিকা : সাধু এবং চলিত গদ্য রীতি

বাংলা সাহিত্যে স্বামী বিবেকানন্দের প্রস্তাবিত বাংলা চলিত রীতির প্রভাব অনুসন্ধানের আর একটি ক্ষেত্রে আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে, 'উদ্বোধন' পত্রিকায়। বিবেকানন্দের স্বপ্নের পত্রিকা 'উদ্বোধন'। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শকে সামনে রেখে দীর্ঘ একশো বছরের বেশি সময় ধরে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে চলেছে এই পত্রিকা। বিবেকানন্দের প্রস্তাবিত যুগান্তকারী ভাষারীতি 'উদ্বোধন' পত্রিকাই সর্বাগ্রে গ্রহণ করবে, তা-ই স্বাভাবিক। কিন্তু ভাবলে অবাক লাগে, 'উদ্বোধন', দু-একটি বিক্ষিপ্ত ব্যতিক্রম ছাড়া প্রথম পঞ্চাশ বছরের আগে চলিত গদ্য ব্যবহারই করেনি। 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', স্বামী সারদানন্দের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' বা বিবেকানন্দের ইংরেজি বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বিখ্যাত রচনাগুলিতে সাধু গদ্যই ব্যবহৃত হয়েছে। 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত রচনাগুলিতে কখনও কখনও তৎসমবহুল সাধু গদ্য ব্যবহৃত হলেও উক্ত-সব প্রধান গ্রন্থগুলিতে অপেক্ষাকৃত সরল বা সরল সাধু গদ্য ব্যবহৃত হত। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ যে-ভাষাকে 'উচ্চবিমিশ্র-ধরণের' বলেছিলেন, এই ভাষা সেই ধরনের। 'উচ্চবিমিশ্রধরণের' প্রসঙ্গ আমরা কিছুটা পরে আলোচনা করব। এখানে পূর্বে কথিত সহজ সাধুগদ্যের উদাহরণ নেওয়া যাক,

''অঘোরমণি কড়ে রাঁড়ি—স্বামীর সুখ কোন দিনই জীবনে জানেন নাই। মেয়েরা বলে, 'ওরা সব যত্নী রাঁড়ি, নুনটুকু পর্য্যন্ত ধুয়ে খায়'—অঘোরমণিও বয়স প্রাপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত তাহাই। বেজায় আচার বিচার। আমরা জানি, একদিন তিনি রন্ধন করিয়া বোক্না হইতে ভাত তুলিয়ে পরমহংসদেবের পাতে পরিবেশন করিতেছেন, এমনসময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কোন প্রকারে ভাতের কাটিটি ছুঁইয়া ফেলেন। অঘোরমণির সে ভাত আর খাওয়া হইল না, এবং ভাতের কাটিটিও গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইল। তিনি যখন প্রথম প্রথম ঠাকুরের নিকট আসিতেছেন, ইহা সেই সময়ের কথা।''[৫৭]

লক্ষণীয়, এই অংশে ক্রিয়াপদ, সর্বনাম, নির্দেশক সাধু রীতির আবার কখনও ক্রিয়াপদ চলিত রীতির। আবার 'প্রাপ্ত', 'গঙ্গাগর্ভে', 'রন্ধন', 'নিক্ষিপ্ত' প্রভৃতি তৎসম শব্দগুলির পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়েছে 'রাঁড়ি', 'বেজায়', 'বোক্না', 'কাটি' প্রভৃতি একেবারে 'গ্রাম্য' শব্দ। আমাদের উল্লিখিত 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত সবকটি প্রধান গ্রন্থই পুরোপুরি এই ধরনের গদ্যে রচিত হয়েছে তা নয়। কিন্তু এই উদাহরণ সহজ সাধু গদ্যের বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে।

এবার নিতান্তই ব্যতিক্রমী রচনাগুলি থেকে গদ্যের নিদর্শন গ্রহণ করা যাক। তৎকালীন সম্পাদক ত্রিগুণাতীতানন্দের 'পাঁচকথা' (১৩০৭ বঙ্গাব্দ) থেকে উদ্ধৃত করা হল—

''ছি, ছি! ভদ্রলোকের ছেলে, লেখাপড়া শিখেছো, একটা কাগজের ভার তুমি পেয়েছো—কোথায়, ধীর হবে, নম্র হবে, নিজের মর্য্যাদা রেখে কাজ করবে, পরের মান্য রেখে কথা কইবে, পরের যাতে মঙ্গল হয় তাই করবে; তা না হয়ে কার্ সঙ্গে লাগ্বো, কার্ ওপর পুরোনো রাগ ঝাড়্বো, কার্ মন্দ কর্বো, কোথায় দুপয়সা পাব—পেয়ে দু কলম লিখে কার সর্ব্বনাশ কর্বো, এরূপ করে বেড়ালে কি বাপু নিজের মঙ্গল হয় না, দেশের—হিত হয়? উচিত কথা বলবে—বলনা, খুব বলবে বই কি, কিন্তু মিষ্টি করে বলবে—যাতে কাজ হয়, যাতে ফল হয়, হিতে বিপরীত যাতে না হয়, দলাদলি যাতে না হয়।''[৫৮]

আফসোস হয় এরকম গদ্য লেখার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কেন ত্রিগুণাতীতানন্দই বা সবধরনের লেখা লিখলেন না এই গদ্যে। স্বামী সচ্চিদানন্দের 'সদাশিব' (১৩০৭ বঙ্গাব্দ), স্বামী স্বরূপানন্দের 'অরণ্যে রোদন' (১৩০৮ বঙ্গাব্দ), স্বামী শুদ্ধানন্দের 'আসল ও নকল' (১৩০৭ বঙ্গাব্দ) প্রভৃতি কয়েকটি রচনা চলিত গদ্যে রচিত। কিন্তু এরকম কয়েকটি রচনা বাদ দিয়ে আর সব রচনা সাধু গদ্যে রচিত, এমনকী রামকৃষ্ণ মিশনের সেবামূলক কাজের সংবাদগুলি পর্যন্ত।

স্বামী বিবেকানন্দের ভাষা সংক্রান্ত আলোচনার পরে, 'উদ্বোধন' পত্রিকায় আর-একটি আলোচনা প্রকাশিত হয় যেখানে ভাষা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ মতামত পাওয়া যায়। ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১ পৌষ, ১৫ পৌষ এবং ১ মাঘ সংখ্যায়, তিনটি কিস্তিতে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (সমালোচনা)' শিরোনামে একটি লেখা লেখেন। তৎকালীন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিভাষণের পরিপ্রেক্ষিতে এটি লেখা হয়েছিল। এই প্রবন্ধে লেখকের ভাষা সংক্রান্ত মতামতের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ মনে হয়, যেখানে তিনি বাংলা ভাষাকে মূল চার ধরনে ভাগ করেছেন—১) উচ্চধরনের, ২) মধ্যম ধরনের, ৩) চলিত এবং ৪) গ্রাম্য বা গাঁওয়ারী। এই চারধরন সম্বন্ধে বলেছেন,

''(১) উচ্চমিশ্র, অর্থাৎ উচ্চ ও মধ্যম ধরণের মিশ্রিত ভাষা; এই ধরণে লিখিতে গেলে, কখন খুব উচ্চ রকমের অলঙ্কারাদি এবং দুরূহ দুরূহ শব্দযুক্ত ভাষার প্রয়োগ হইতেছে, আবার কোন স্থলে বা

মধ্যম ধরণেরও ভাষা বাহির হইতেছে; মাসিক বা সংবাদপত্রাদি এবং সাধারণ পুস্তকাদিতে প্রায় এই ধরণেরই লেখা দেখা যায়। (২) মধ্যম মিশ্র, অর্থাৎ—মধ্যম ও চলিত ধরণের মিশ্র ভাষা; এইরূপ ভাষায় সচরাচর সকলে পত্রাদি লিখিয়া থাকেন :- দু-দশটা শুদ্ধ কথাও থাকে এবং দশ-বিশটা 'হচ্চে' 'যাচ্চে'-গোছ চলিত কথাও থাকে। (৩) চলিত মিশ্র, অর্থাৎ চলিত ও গাঁইয়ারী মিশ্রিত ভাষা, এইরূপ ভাষা প্রায় ছোট বালকবালিকা কর্ত্তৃক পত্রাদি লিখিবার কালীন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এবং (৪) উচ্চ বিমিশ্র অর্থাৎ ইহাতে সর্বপ্রকার ধরণই ব্যবহার হয়—উচ্চ, মধ্যম, চলিত এবং এমন কি স্থল বিশেষে গাঁওয়ারী পর্য্যন্তও ব্যবহার হইয়া থাকে।"[৫৯]

লেখকের পক্ষপাত 'উচ্চ বিমিশ্র' ধরনের ভাষায়। কারণ ''উচ্চ বিমিশ্রধরণের লেখায় সর্বপ্রকার রসেরই আস্বাদ পাওয়া যায় এবং অতি সুমধুর লাগে।" মনে হয়, এখানেই তফাত হয়ে গেল বিবেকানন্দের মতামতের সঙ্গে পরবর্তী কালের উদ্বোধনের ভাষা ব্যবহারের পথচলায়। বিবেকানন্দ সর্ববিষয়ে মুখের ভাষাকেই গ্রহণের পক্ষপাতী, যা ত্রিগুণাতীতানন্দ কথিত 'উচ্চবিমিশ্রধরণের' মতো সাধু ও চলিত গদ্যের মিতালিতে তৈরি নয়। হতে পারে, বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' ছাড়া আর কোনও চলিত ভাষার আদর্শ গ্রন্থ 'উদ্বোধন'-এর সামনে ছিল না। ফলে উনিশ শতকীয় দ্বিধা কাটিয়ে ওঠা 'উদ্বোধন'-এর পক্ষেও সম্ভব ছিল না। উপরন্তু বিবেকানন্দের বিস্তৃত সাধুভাষার আদর্শ তাঁদের সামনে ছিল, যা সমকালে প্রচলিত রীতির সঙ্গে মানানসই। কিন্তু আশ্চর্য হয়েছি আমরা এই কারণেই যে, বিবেকানন্দের যুগান্তকারী মতামত ও সেই মতের প্রয়োগ থাকা সত্ত্বেও এবং সেধরনের গদ্যের প্রশংসা করেও 'উদ্বোধন'-এর কোনও লেখকই আদর্শ হিসাবে, মুখের ভাষানির্ভর চলিত গদ্যকে, নিজেদের লেখায় ব্যবহার করলেন না। সফল হওয়া না হওয়া, প্রচেষ্টার পরের কথা। কিন্তু প্রচেষ্টাটাই না থাকা, আমাদের অবাক করে। প্রচেষ্টার অনুপস্থিতির আর-একটি কারণ অনুমান করা অবশ্য সম্ভব। উক্ত প্রবন্ধেই স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ একটি মন্তব্য করলেন, ''পরন্তু, ভাষার গৌরব—বচনবিন্যাসে ততটা নয়, যতটা ভাব-প্রকাশে।"[৬০] অথচ ভাবপ্রকাশের সঙ্গে ভাষাকেও সমান গুরুত্ব দিয়েছিলেন বিবেকানন্দ। তাহলে কি 'উদ্বোধন' রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রদত্ত ভাবের প্রকাশকেই অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে ভাষাকে কম গুরুত্ব দেওয়ার ফলেই, চলিত গদ্য রচনায় বিবেকানন্দের যোগ্য উত্তরাধিকারী হতে পারল না? এই প্রশ্ন, আর-এক অনুসন্ধানের বাসনা আমাদের মনে স্থান দিল।

শেষকথা

আমাদের আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পেলাম, স্বামী বিবেকানন্দের সাধু গদ্যের মতো সাধু গদ্য বিশ শতকে অল্পস্বল্প চর্চিত হতে হতে ক্রমশ চর্চার বাইরে চলে গেল। নতুন যে-সাধু গদ্য রীতির উদ্ভব হল তা একদিকে কবি-প্রাবন্ধিকদের হাতে ভিন্ন মাত্রা পেল। সেই ভিন্ন মাত্রা পাওয়া সাধু গদ্য আসলে, চলিত গদ্যের কাঠামোয় সাধু গদ্যের বুদ্ধিদীপ্ত অবস্থান। কথাসাহিত্য-প্রবন্ধ-গবেষণাকর্ম প্রভৃতি ভিন্ন ধরনের সাধু গদ্যকে আশ্রয় করল, যাকে আমরা 'তরল সাধু গদ্য' বা 'সরল সাধু গদ্য' বলতে চেয়েছি। উনিশ শতকীয় সাধু গদ্যের অবক্ষেপ কোথাও কোথাও দেখা গেল বটে, যেমন সুবোধ ঘোষ বা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায়। কিন্তু সে-সাধু গদ্য আর মূল ধারার নয়। বিশেষ ধরনের সাহিত্যে বা বলা চলে, সাহিত্যরচনায় শখ করে এধরনের সাধুগদ্যের ডাক পড়ে। ফলে

এ-ধরনের সাধু গদ্য হয়ে পড়ল, শৈলীবিজ্ঞানের ভাষায় 'রেজিস্টার'-বদ্ধ।

স্বামী বিবেকানন্দের প্রস্তাবিত এবং প্রবর্তিত চলিত গদ্য ব্রহ্মবান্ধব বা বিনয়কুমারের মতো দু-একজন প্রাবন্ধিক ছাড়া আর চর্চিত হল না। হতে পারে, ধর্মজগতের মানুষ বলেই মূল সাহিত্যধারায় বিবেকানন্দের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারল না। এমনও হতে পারে তাঁর অব্যবহিত পরেই প্রমথ চৌধুরীর আন্দোলন পরবর্তী সাহিত্যিকদের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। সেই প্রভাবের জৌলুসে ঢাকা পড়ে গেলেন বিবেকানন্দ। বিশেষত, প্রমথ চৌধুরী বিবেকানন্দের ভূমিকা উল্লেখ পর্যন্ত করেননি। তাঁর মতো সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্বন্ধে সদাজাগ্রত মানুষ বিবেকানন্দের চলিত গদ্যের প্রসঙ্গ জানতেন না এমন ভাবতে বেশ বেগ পেতে হয়। অবশ্য এটাও হতে পারে, তিনি বিবেকানন্দ বা 'উদ্বোধন' পত্রিকাকে ধর্মজগতের মানুষ বা পত্রিকা ভেবে এড়িয়ে গেছেন। আবার এমনটাও হতে পারে যে, তাঁর কৃষ্ণনাগরিক বৈদগ্ধ্য বিবেকানন্দের কলকাতার ভাষাগ্রহণের প্রস্তাবকে মেনে নিতে পারেনি বা বিবেকানন্দের কলকাতার বুলির একনিষ্ঠ অনুসরণ মেনে নিতে পারেনি। আমরা উদ্ধৃত করে আগেই বলেছি, প্রমথ চৌধুরী লিখিত ভাষায় কেমনভাবে কলকাতার ভাষার 'ঠোঁটকাটা ভাব'কে গ্রহণে আপত্তি জানিয়েছেন। তাই চলিত গদ্যের প্রচলনের ফলে, সমসাময়িক 'পূর্ণিমা' প্রভৃতি পত্রিকায় সমালোচনার যে-ঝড় উঠেছিল, তাতে বিবেকানন্দ বিরূপ পক্ষদের কাছ থেকে যতটা নিন্দিত হয়েছেন সেই তুলনায় প্রশংসা বা 'প্রচারের' আলো পেলেন না।[৬১] রবীন্দ্রনাথের মতো বিখ্যাত মানুষের প্রশংসিত মন্তব্যও রয়ে গেল ব্যক্তিগত আলাপচারিতার মধ্যেই।

কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর প্রস্তাবিত মুখের ভাষাকে লেখায় গ্রহণ এবং তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত লিখিত গদ্যের মধ্যে ব্যবধান থেকে গেল বলেই যাঁরা আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাঁর বক্তব্যে, তাঁদের দ্বিধাগ্রস্ত হওয়াটা খুব স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ নিজের বিরাট প্রতিভা-বলে চলিত গদ্য ভাষাকে যেভাবে নির্মাণ করে নিয়েছিলেন, সব সাহিত্যিকদের পক্ষে সেটা সম্ভব ছিল না। উপরন্তু রবীন্দ্র-উত্তর বেশিরভাগ আধুনিক কবি এমন ধরনের গদ্য লিখলেন যা চলিত গদ্যের আদর্শকে ঠেলে দিল গভীর পুনর্বিতর্কের দিকে। যা হতে পারত সমাধান, তা পুনরায় সমস্যা হয়ে উঠল। সেই পুনঃসমস্যার কথা জানা যায় রাজশেখর বসুর প্রবন্ধ থেকে যিনি সাধু ও চলিত গদ্যের মধ্যে দীর্ঘ দ্বন্দ্বের ইতিহাসকেই উল্লেখ করেছেন। আমাদের ভাবনার সমর্থন পাই শঙ্করীপ্রসাদ বসুর মন্তব্যে : ''প্রমথ চৌধুরীর ধারাপথে বেশ কয়েকদশক বাংলা সাহিত্যে 'সাধু কৃত্রিমতার' পরিবর্তে 'চলিত কৃত্রিমতা' জায়গা জুড়ে বসেছিল—যাতে বিবেকানন্দের ভাষাদর্শের অনুগামিতা হয়েছে দ্বিধাগ্রস্ত।''[৬২] মনে হয়, বাংলা কথাসাহিত্য, সিরিয়াস প্রবন্ধ, গবেষণামূলক প্রবন্ধ বা বিশ্ববিদ্যালয়-পাঠ্য প্রবন্ধের ধারা প্রভৃতিতে সেই দ্বিধাগ্রস্ততারই দীর্ঘ পরিণাম ধরা আছে।

অথচ স্বামী বিবেকানন্দের ভাষাদর্শ যদি অনুসরণ করত বাংলা সাহিত্য, তাহলে বাংলা সাহিত্যে কোন মণিমুক্তা ফলত তা আন্দাজ করা যায় অন্নদাশঙ্কর বা সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মতো প্রাবন্ধিকদের দেখলে, অথবা বাংলা সাহিত্যে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বা রম্যরচনার ধারার চলিত গদ্য দেখলে। এই ধারার সঙ্গে কোনও কোনও ভ্রমণ-সাহিত্য বা পত্রসাহিত্যকেও গ্রহণ করা যেতে পারে। বিবেকানন্দের মৌখিক ভাষানির্ভর সাহিত্য রচনার প্রস্তাব যে কতটা সঠিক ছিল তার নিদর্শন পাওয়া যায় সৈয়দ মুজতবা আলির সবধরনের গদ্যরচনায়।

যে-চলিত গদ্য একদিন বিশেষ বিশেষ ধরনের

সাহিত্যে আবদ্ধ 'রেজিস্টার' ছিল, প্রমথ চৌধুরীর আন্দোলনে যে-চলিত গদ্য 'রেজিস্টারে'র গণ্ডি ভেঙে মূলধারায় এসে মিশল, সেই গদ্য বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পেরোতে না পেরোতেই পুনরায় কি বিশেষ ধরনের সাহিত্যের 'রেজিস্টার' হয়ে উঠল না? অধুনাতম সময়ের শেষ ত্রিশ-চল্লিশ বছরে চলিত গদ্য সর্বক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে হয়তো। কিন্তু মাঝখানের যে-সময়টা পেরিয়ে গেল সেই সময়ে বিবেকানন্দের চলিত গদ্যের কণ্ঠস্বর কোথাও কি অবহেলিত থেকে গেল না? তাঁর বিরাট কণ্ঠের অনুসরণ হয়তো সবার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁর কণ্ঠের অনুসরণে, প্রচেষ্টিত ব্যর্থতারও যদি ইতিহাস নির্মিত হত, তাহলে তা কি আমাদের সাহিত্যকে গৌরবে দীপ্ত করত না? আজ মধ্যবর্তী সময় পেরিয়ে, নতুন সময়ের এপারে দাঁড়িয়ে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, আজ তাঁর কণ্ঠস্বর চর্চার অভাবেই কি দূরতর কোনও ধ্বনি হয়েই থেকে যাবে? আজকের আলোচনায়, গবেষণায় তাঁর কণ্ঠস্বরকে পুনরায় আবিষ্কারের চেষ্টা চলছে। কিন্তু সাহিত্যসৃজনে তাঁর কণ্ঠস্বর প্রেরণার উৎসভূমি হিসাবে আদৌ কি কাজ করছে? অথবা এটাই বাস্তব যে তাঁর মতো প্রতিভার একটিও কণ্ঠস্বরের অনুসরণে একটি জাতির বহু প্রজন্মের মন-মনন-মেধা-পরিশ্রম নিবেদিত হতে পারে। কোনও নবীন-অরুণ প্রভাতে হয়তো তাঁর কণ্ঠস্বর সর্বব্যাপী প্রভাবে সমৃদ্ধ-সার্থক করবে তাঁরই জাতির কোনও প্রজন্মান্তরকে।

তথ্যসূত্র

৪৪। *সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী* (মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স : কলকাতা, ১৩৫৬), খণ্ড ১, 'কথারসিক সৈয়দ মুজতবা আলী' অংশ

৪৫। তদেব, খণ্ড ৪, পৃঃ ২

৪৬। তদেব, অন্তর্গত 'পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা', খণ্ড ১০, পৃঃ ১৮০-১৮১

৪৭। তদেব, পৃঃ ১৯১

৪৮। তদেব, পৃঃ ২০৭

৪৯। সৈয়দ মুজতবা আলী, *পঞ্চতন্ত্র*, অন্তর্গত 'দাম্পত্য জীবন' (বিশ্ববাণী প্রকাশনী : কলকাতা, ২০১০), পৃঃ ১৮১

৫০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *সুনন্দর জার্নাল*, অন্তর্গত 'গাধার ব্যক্তিত্ব' (মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স : কলকাতা, ১৪১৬), পৃঃ ৩৪

৫১। বিনয় ঘোষ, *কালপ্যাঁচার রম্যরচনাসংগ্রহ*, অন্তর্গত 'রিকশাযাত্রী', (প্রকাশ ভবন : কলকাতা, ২০১০), পৃঃ ১৭

৫২। সম্পাদনা : সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, *বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র (বিরূপাক্ষ) রচনাসমগ্র*, (লালমাটি : কলকাতা, ২০০৯), খণ্ড ১, পৃঃ ৬৩১

৫৩। তদেব, অন্তর্গত 'পুজোর ঝঞ্ঝাট', পৃঃ ৪৯

৫৪। তারাপদ রায়, *রম্যরচনা ৩৬৫*, অন্তর্গত 'ঘুম' (১) (আনন্দ পাবলিশার্স : কলকাতা, ২০০৮), পৃঃ ১৫

৫৫। প্রদ্যোৎকুমার ভদ্র, *ত্রিশিরার কড়চা*, অন্তর্গত 'মরিতে চাহিনা আমি', (লালমাটি, ২০১০), পৃঃ ৭১

৫৬। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, *মাপা হাসি চাপা কান্না*, অন্তর্গত 'ছাগলের বোধোদয়', (পত্রভারতী : কলকাতা, ২০১১), অখণ্ড, পৃঃ ১৮৯

৫৭। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, উত্তরণ, শতবর্ষের উদ্বোধন (১৮৯৯-১৯৯৯), 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (সমালোচনা)', উদ্বোধন শতবর্ষের সিডি রম, সিডি ২, ১৩১৫, অগ্রহায়ণ।

৫৮। তদেব, 'পাঁচকথা', সিডি ১, ১৩০৭, ফাল্গুন-১

৫৯। তদেব, 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (সমালোচনা)', সিডি ১, ১৩০৬, পৌষ-১

৬০। তদেব, পৌষ-২

৬১। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ* (মণ্ডল বুক হাউস : কলকাতা, ২০১৩), খণ্ড ৫, পৃঃ ২১০-১২

৬২। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *স্বামী বিবেকানন্দ : নতুন তথ্য নতুন আলো*, অন্তর্গত 'স্বামী বিবেকানন্দ : সাহিত্যে ঐতিহ্য ও আধুনিকতা' (আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৫), পৃঃ ২৫৪